জুবিলি সার্কাসের আজব খেলা

অজেয় রায়

প্রথম প্রকাশ আনন্দমেলা

২০শে জুন ১৯৮৫

১০ জুলাই ১৯৮৫

জুবিলি সার্কাসের আজব খেলা

অজেয় রায়

সকাল প্রায় নটা। গেট খুলে দ্রুত পায়ে এগোতে এগোতে সুনন্দ আমায় ডেকে বলল, "অসিত, সার্কাস দেখতে যাবি ?"

বারান্দায় ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে বই পড়ছিলেন মামাবাবু। সুনন্দর কথা শুনে বইখানা থেকে চোখ তুলে সুনন্দকে বললেন, "কোথায় সার্কাস ?"

"বোলপুরে," উত্তর দিল সুনন্দ।

মামাবাবু বললেন, "কী নাম ?"

"জুবিলি সার্কাস। তেমন নামকরা কিছু নয়। ছোট সার্কাস। তবে কয়েকটা নাকি দারুণ খেলা আছে।"

"তুমি জানলে কী করে ?" মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

সুনন্দ বলল, "বোলপুরে টর্চটা সারাতে গিয়েছিলাম। সেখানে দোকানে বসে কয়েকজন লোক গল্প করছিল সার্কাসের।"

সুনন্দর গলা পেয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। বললাম, "চলুন না মামাবাবু সার্কাসটা আজ দেখেই আসি।"

মামাবাবু বললেন, "তা মন্দ নয়। অনেকদিন দেখিনি সার্কাস। খুব একটা বাজে যদি না হয়।"

সুনন্দ একটু থতমত খেয়ে বলল, "আপনি যাবেন ? বেশ আমি গিয়ে টিকিট কেটে রাখব। পাঁচটার শো-ই ভাল। মনে হয় খেলাগুলো ইন্টারেস্টিং হবে।"

এখন মামাবাবু সুনন্দ এবং আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। মামাবাবু হচ্ছেন বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ প্রফেসর নবগোপাল ঘোষ। সম্পর্কে আমার বন্ধু সুনন্দর মামা। অবিবাহিত। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। আমার নাম অসিত রায়। সুনন্দ বোস আমার ছেলেবেলার বন্ধু। মামাবাবুর কাছেই সে মানুষ। আমি ও সুনন্দ সবেমাত্র পোস্ট-গ্রাজুয়েটের চৌকাঠ ডিঙিয়েছি। এখন রিসার্চ করছি। সুনন্দর বিষয় প্রাণিতত্ত্ব, আমার ইতিহাস।

দুর্গাপূজার পর আমরা তিনজনে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলাম কয়েকদিনের জন্য। মামাবাবুর পরিচিত একজনের একটা বাড়ি ছিল শান্তিনিকেতনে। সেখানে উঠেছিলাম। রান্নার ভার বাড়ির মালি চণ্ডীর হাতে। চালিয়ে দিচ্ছিল মোটামুটি। শুধু

শান্তিনিকেতনে নয়, কাছের খোয়াইয়ে, কোপাই নদীর ধারে, আশেপাশের গ্রামে খুব বেড়াচ্ছিলাম। বেড়ানোর উৎসাহটা আমার চাইতে সুনন্দরই বেশি। মামাবাবু বেশিরভাগ সময় বই পড়ে বা লেখালেখি করে কাটাচ্ছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে মাইল-দুই দূরে ছোট্ট শহর বোলপুর। ওখানেই রেলস্টেশন ও দোকানপাট।

সার্কাসটার তাঁবু পড়েছিল বোলপুর রেল-ময়দানে।

বিকেল পাঁচটায় দ্বিতীয় শো শুরু হবার দশ মিনিট আগে মামাবাবু ও আমি সাইকেল-রিক্‌শা চেপে সার্কাসের সামনে হাজির হলাম। সুনন্দ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চিনেবাদাম চিবুচ্ছিল। আমাদের দেখে কাছে এল।

সার্কাসটির অবস্থা মোটেই সুবিধের মনে হল না। তাঁবুর কাপড় পুরনো ও জায়গায়-জায়গায় বড়-বড় তাপ্পি মারা। কোথাও কোথাও ফুটো। লাল কোট ও নীল পাতলুন পরা যে-লোকটি ভিতরে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে টিকিট চেক করছিল তার পোশাক বা চেহারা কোনওটাই তেমন চকচকে নয়। সার্কাসের সামনের দিকে খানিকটা জায়গা ঘেরা। লম্বালম্বি করে সাজানো ফাঁক-ফাঁক কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো উঁচু বেড়া। ঘেরার গায়ে টিকিট কাউন্টারে ভিড়। নানান বয়সী লোক বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। টিকিট কেটে লোক ঢুকছে ভিতরে। সার্কাসের সামনে চায়ের দোকান বসে গেছে। তেলেভাজা, চিনেবাদাম ভাজারও খুব বিক্রি চলছে। মাইকে ক্রমাগত কান-ফাটানো আওয়াজে ঘোষণা করা হচ্ছে, "এবার সেকেণ্ড শো শুরু হচ্ছে। চটপট টিকিট কেটে ঢুকে পড়ুন। চলে আসুন, চলে আসুন। আর দেরি নেই—"

টিকিট-কাউন্টারের মাথায় ঝুলছে কাঠের ফালির ওপর হাতে আঁকা সার্কাসের খেলার রঙচঙে বিজ্ঞাপন। নানারকম জন্তু-জানোয়ার ও নারী-পুরুষের দুর্ধর্ষ সব খেলার ভঙ্গি। এমন ছবি সব সার্কাসেই থাকে। এর মধ্যে ক'টা খেলা যে সত্যি দেখাবে, কে জানে! চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে সুনন্দকে জিজ্ঞেস করলাম, "হাতি আছে?"

সুনন্দ একটু অপ্রস্তুতভাবে মাথা নাড়ল।

"ধুস্। তাহলে আছেটা কী?"

"কেন সিংহ আছে, আমি খোঁজ নিয়েছি।" সুনন্দ উৎসাহভরে জানাল।

যা হোক আমরা ভিতরে ঢুকলাম। দর্শকের ভিড় ভালই হয়েছে। তাঁবুর মাঝখানে খুঁটি পুঁতে দড়ি লাগিয়ে অনেকটা জায়গা গোল করে ঘেরা। ওর ভিতর খেলা দেখানো হবে। ঘেরার একধারে কয়েক সারি টিনের চেয়ার পাতা। এগুলোই সব চাইতে দামি সিট—দু-টাকার। তিনজনে বসলাম চেয়ারে। এছাড়া কাঠের গ্যালারি আছে। একটাকার টিকিট এবং মাটিতে শতরঞ্চিতেও বসেছে দর্শক। তাদের টিকিটের হার মাথাপিছু পঞ্চাশ পয়সা।

ঢং। ঘণ্টা দিয়ে সার্কাস আরম্ভ হল। তাঁবুর এককোণে একটা উঁচু মঞ্চের ওপর চেয়ারে বসে ছিল তিনটি যুবক। তাদের পরনে রঙিন শার্ট ও ট্রাউজার্স এবং প্রত্যেকের টেরির খুব বাহার। তাদের সামনে সাজানো ড্রাম, ঝাঁঝর, ফ্লুট ইত্যাদি নানারকম বাদ্যযন্ত্র। ওরা ব্যাণ্ড-পার্টি। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা তিনজনে [illegible] করল। সার্কাসের খেলোয়াড়দের রিংয়ে ঢোকার পথের পর্দা সরিয়ে ছুটে এল ঝলমলে পোশাক পরা দুটি বারো-তেরো বছরের ছেলেমেয়ে। জিমনাস্টিক্‌স্ দিয়ে শুরু হল।

এরপর একটার পর একটা খেলা। বছর-পনেরোর একটি মেয়ে এবং এক মহিলার এক চাকার সাইকেলের কসরত। একজন মাঝবয়সী পুরুষের মই নিয়ে ব্যালান্স, ইত্যাদি, ইত্যাদি। খেলোয়াড়দের অনেকের চেহারায় ভারী মিল। মনে হচ্ছিল হয়তো তারা একই পরিবারের লোক।

খেলাগুলো নেহাত মামুলি। তবে জমাচ্ছিল দুই জোকার। মুখে রং-মাখা, কিম্ভূত পোশাক পরা, মাথায় বিরাট গোল টুপি, পায়ে উলটামুখো জুতো। দু'জনের মধ্যে বেঁটেটিরই দাপট বেশি। লোকটি বামন, তিন ফুটের বেশি লম্বা নয়। সে চরকির মতো ঘুরছিল আর একখানা ফাটা কাঠ দিয়ে সার্কাসের যাকেই হাতের কাছে পাচ্ছিল তাকেই চড়াত করে এক ঘা কষাচ্ছিল এবং ক্যানকেনে স্বরে চিৎকার করে ছাড়ছিল রসিকতা। অন্যরা তাকে ডাকছিল মাস্টার পটল নামে।

খেলোয়াড়রা সবাই তেমন পোক্ত নয়। কয়েকজন বেশ কাঁচা। জমি থেকে পাঁচ-ছয় হাত উঁচুতে টান করে টাঙানো মোটা তারের ওপর দিয়ে ছাতা হাতে নাচতে নাচতে যাওয়ার খেলায় দুটি মেয়ে দু'ধার থেকে এল বটে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি মেয়ে আর কিছুতেই অন্য প্রান্তে পৌঁছতে পারল না। তিন-তিনবার সে চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিবারই টাল খেয়ে মাঝপথেই লাফিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। তখন মাস্টার পটল তার হাত থেকে ছাতা কেড়ে নিয়ে নিজে তারে উঠে দিব্যি নেচে নেচে একধার থেকে অন্য ধারে চলে গেল। ব্যর্থ মেয়েটি করুণ মুখে বিদায় নিল। পুরুষদের ট্রাপিজের খেলাও তেমন জমল না। একেবারে দায়সারা ব্যাপার।

মামাবাবু উসখুস শুরু করলেন, "নাঃ, সুনন্দ, আর একটু বেটার আশা করেছিলাম। ওই মাস্টার পটলটি অবশ্য খাসা।"

সুনন্দ কাচুমাচুভাবে মিনমিন করে কী জানি আওড়াল।

সহসা ব্যাণ্ড সুর পালটাল এবং তারপরই পর্দা সরিয়ে একজন রিং-এ ঢুকল, সঙ্গে সরু দড়িতে বাঁধা বড়সড় এক লালমুখো বাঁদর।

লোকটির বয়স মনে হল বছর-তিরিশের মধ্যে। নাক-মুখ বেশ চোখা, লম্বা ছিপছিপে, শ্যামবর্ণ। পরনে সাদা ট্রাউজার্স, সাদা ফুলহাতা শার্ট, কালো টাই। ঝকঝকে বাদামি জুতো। হাতে একটা ছোট বেতের ছড়ি। ইনি রিং-মাস্টার বা অ্যানিম্যাল-ট্রেনার সন্দেহ নেই। বাঁদরটার মাথায় কাপড়ের লাল টুপি, গলায় বকলস।

বাঁদরটি নানারকম খেলা দেখাতে লাগল। যেমন, বেহালা বাজানো, হুঁকো খাওয়া, ডিস্কো-ড্যান্স। ঘন-ঘন করতালি পড়ল। হঠাৎ ট্রেনার রিংয়ের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলল। দর্শকদের কোলাহল একটু কমলে ট্রেনার বলে উঠল, "লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টেলমেন, সমবেত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ, আমার বাঁদর শুধু খেলা নয়, লেখাপড়াও শিখছে। কারণ ও জানে মুখ্যু হয়ে থাকলে ওর [illegible] নেই। প্রোমোশন হবে না। [illegible]

তাই ও ভাষা শিখছে। মানুষের ভাষা। যাতে বই-টই পড়তে পারে। তারপর পাশটাস দিতে মানুষের ইস্কুল-কলেজে পড়তে চায়। তবে এখনও ওর শিক্ষা বেশি এগোয়নি। মাত্র কয়েকটা কথা শিখেছে। তবে ওর চেষ্টা আছে, হবে।”

কথা বলতে বলতে সে হাতের দড়ি, যা দিয়ে বাঁদরটা বাঁধা রয়েছে সেটা রিংয়ের ভিতরে একটা খুঁটির গায়ে বেঁধে দিয়ে নিজে খানিক তফাতে সরে গেল। তারপর হেঁকে বলল, “মানিকচাঁদ, খিদে পেয়েছে ?”

মানিকচাঁদ ওরফে টুপি-পরা বাঁদরটি অমনি ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

ট্রেনার বলল, “ইয়েস্। মানিকচাঁদ বলছে, ওর খিদে পেয়েছে। অলরাইট, ইউ মাস্টার পটল, মানিকচাঁদকে একটা কলা খাওয়াও দেখি।”

অমনি বেঁটে জোকার মাস্টার পটল পাঁইপাঁই করে দৌড়ে চলে গেল পর্দা ঠেলে। সার্কাসের অন্দরমহলে। এবং প্রায় তক্ষুনি মস্ত একটা সিঙ্গাপুরি কলা হাতে নিয়ে উঁচু করে নাড়তে নাড়তে ঢুকল রিংয়ে। মানিকচাঁদকে ঘিরে এক চক্কর ঘুরল কলাটা দেখিয়ে দেখিয়ে। তারপর মানিকচাঁদকে এগিয়ে দিল কলাটা।

বাঁদরটা টপ করে কলাটা কেড়ে নিল। কলাখানা চটপট ছাড়িয়ে ভারী ফুর্তিতে সে সবেমাত্র এক কামড় বসিয়েছে, ট্রেনার আরও দূরে সরে গিয়ে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, “ব্যস্, আর নয়। এবার কলা রাখো, মানিকচাঁদ।”

আশ্চর্য ! অমনি বাঁদরটা কলা ফেলে দিল।

ট্রেনার এবার দর্শকদের উদ্দেশ করে বলল, “আপনারা হয়তো ভাবছেন আমি ইশারা করেছি। গলার স্বরের ইঙ্গিতে হুকুম করেছি। ওইভাবে কলা খেতে বলেছি বা বারণ করেছি। কিন্তু মোটেই তা নয়। আমি আগেই বলেছি, মানিকচাঁদ কিছু-কিছু মানুষের ভাষা শিখেছে। তাই ও আমার কথা বুঝে কাজ করছে। ও, আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? অলরাইট, আপনারাই কেউ ওকে অর্ডার করুন কলা খেতে। আবার হুকুম করুন খাওয়া বন্ধ করতে। দেখুন পরীক্ষা করে ও বুঝতে পারে কি না। ইংরিজি, বাংলা বা হিন্দি, যে-কোনও ভাষায়।”

ট্রেনারের কথা শেষ হতে না হতেই দর্শকদের মধ্যে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। বহু কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল—

“মানিকচাঁদ কলা খাও।”

“এ মানিকচাঁদ কেলা খাও।”

“মানিকচাঁদ ইট বেনানা।”

মানিকচাঁদ নির্বিকারভাবে বসে বসে কান চুলকোতে লাগল। কলার প্রতি কোনও আগ্রহই দেখাল না।

ট্রেনার হাত তুলল। দর্শকদের জানাল, “এভাবে নয়। এভাবে নয়। মানিকচাঁদ আগে মিলিটারিতে ক্যাপ্টেন ছিল। মাংকি রেজিমেণ্ট, বেনারস। খুব ডিসিপ্লিন মানে। এক-এক করে বলতে হবে, নইলে ও অর্ডার মানবে না। মিলিটারি নিয়ম।”

অমনি গ্যালারিতে একটি শুঁটকো ঢ্যাঙা লোক উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, “বাবা মানিকচাঁদ, কলাটা খেয়ে

ফেলো। খাও, খাও।”

অবাক কাণ্ড। মানিকচাঁদ কলাটা কুড়িয়ে নিয়ে গোগ্রাসে কামড় দিল।

ঢ্যাঙা লোকটি ফের চেঁচাল, “ব্যস. আর খেও না।” অমনি মানিকচাঁদের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সে কলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এবার চেয়ারে-বসা প্যান্ট-শার্ট পরা এক যুবক চেঁচাল, “ক্যাপ্টেন মানিকচাঁদ, ইট ইওর ব্যানানা।”

তৎক্ষণাৎ বাঁদরটি কলাটা তুলে নিয়ে ফের খেতে শুরু করল।

“স্টপ।” হুকুম দিল যুবক।

ব্যস, মানিকচাঁদের খাওয়া বন্ধ। যদিও হাতে তার আধখানা কলা। “ডোন্ট ইট ইওর ব্যানানা।” হঠাৎ মামাবাবুর হুঙ্কার শুনে, সব দর্শক অবাক হয়ে তাকাল তাঁর দিকে। মামাবাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি ফের হুকুম দিলেন, “নাউ স্টার্ট ইটিং।”

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে মানিকচাঁদ গপ্‌গপ্‌ করে বাকি কলাটুকু শেষ করে ফেলল।

মামাবাবু হতভম্বের মতো বললেন, “স্ট্রেঞ্জ।”

সুনন্দ ফিসফিস করে বলল, “সত্যি অদ্ভুত। আজব ব্যাপার। দোকানের লোকগুলো বলছিল বটে এইরকম দেখায় কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি।”

ট্রেনারসহ মানিকচাঁদ ফিরে গেল।

এরপর কালো ট্রাউজার্স ও ঘিয়ে রঙের ফুলহাতা শার্ট পরা একজন মাঝারি লম্বা, শক্তসমর্থ গম্ভীরদর্শন বয়স্ক পুরুষ এসে কতগুলো কাঠের বল এবং রবারের রিং নিয়ে জাগলিং অর্থাৎ লোফালুফির কসরত দেখিয়ে গেল।

আবার ব্যাণ্ড খুব তেজের সঙ্গে বেজে উঠল। সেই আগের ট্রেনার বা রিং-মাস্টারটি ঢুকল। তার পিছনে পিছনে এল একটা ছোট ধবধবে সাদা লোমওলা কুকুর।

কুকুরটি ট্রেনারের নির্দেশমতো নানারকম খেলা দেখাতে লাগল। যেমন, দুপায়ে হাঁটা, আগুনের বলয়ের মধ্য দিয়ে ঝাঁপ। হারমোনিয়াম বাজানো ইত্যাদি।

অনেকগুলো খেলার পর ট্রেনার কুকুরটিকে দেখিয়ে বলল, “এই পঞ্চুও কিছু-কিছু মানুষের ভাষা শিখেছে। আপনারা পরখ করে দেখতে পারেন। আমি দূরে থাকব। যেমন ধরুন, পঞ্চু খুব সৎ আর পাহারাদার কুকুর। তাই চোর বদনাম দিলে ও ভীষণ চটে যায়। আপনারা ওকে চোর বলে দেখতে পারেন, কী করে। বাংলা বা ইংরিজিতে বলবেন। হিন্দিটা এখনও ওর ভাল রপ্ত হয়নি। তবে সবাই একসঙ্গে চেঁচাবেন না। হ্যাঁ, ও চটে গেলেই কিন্তু মাপ চেয়ে নেবেন। নইলে ও তেড়ে গিয়ে কামড়ে দিতে পারে। তখন আমায় দোষ দেবেন না।”

কথা শেষ করে ট্রেনার পঞ্চু-কুকুরকে একটা টুলের ওপর বসিয়ে রেখে নিজে ওর পিছনে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। এবং দর্শকদের ইশারা করল—বলুন।

গ্যালারির সেই ঢ্যাঙা লোকটি তাক করেই ছিল। তক্ষুনি চিৎকার দিল,“এই ব্যাটা পঞ্চু চোর।”

বলামাত্র কুকুরটা দাঁত বের করে গরগর করে উঠল। তার গায়ের লোম খাড়া। চোখ জ্বলছে যেন রাগে।

ঢ্যাঙা ভয় পেয়ে অমনি হাত জোড় করে বলে উঠল, “দোহাই বাপ, মাপ করো, ঘাট হয়েছে।”

ব্যস, পঞ্চু ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

“ওকে ইংরিজিতে চোর বলো তো।” মামাবাবু সুনন্দকে নির্দেশ দিলেন।

সুনন্দ হাঁক ছাড়ল, “পঞ্চু ইউ থিফ্‌।”

ফের পঞ্চু দাঁত খিচিয়ে গোঁ-গোঁ করতে লাগল।

“ইয়েস ইউ আর এ থিফ্‌।” এবার মামাবাবুর গলা।

পঞ্চু রীতিমত খেপে গেল। সে টুল থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে গর্জন ছাড়ল।

“এক্সকিউজ মি পঞ্চু।” সুনন্দ ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচাল।

অমনি পঞ্চু শান্ত হয়ে ফের টুলে চড়ে বসল।

“আশ্চর্য! হতভম্ব মামাবাবু একেবারে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন, আমার ও সুনন্দর মুখেও রা নেই। অন্য দর্শকরাও থ। মামাবাবু বললেন, “ভাবছিলাম হয়তো এমনভাবে শেখানো হয়েছে যে, প্রথম কথাটায় রাগ দেখায় এবং দ্বিতীয় কথাটায় শান্ত হয়। কিন্তু কই না! একদম ঠিকঠাক রিঅ্যাকশন হল। ঠিক যেন মানে বুঝে! আর যেন সত্যি সত্যি রেগে যাচ্ছিল চোর বললে। রাগের ভান বলে তো মনে হল না।”

পঞ্চুকে নিয়ে ট্রেনার ফিরে গেল।

আবার সেই বয়স্ক কালো ট্রাউজার্স পরা লোকটির আবির্ভাব। এবার দেখাল ছোট-ছোট রঙিন মাছসমেত বড় এক জগ জল খাওয়া এবং তা সবসুদ্ধ ওগরানোর খেলা। দু-চারটে হাততালি জুটল বটে, কিন্তু তখন দর্শকদের মন পড়ে রয়েছে জন্তু-জানোয়ারের খেলার দিকে। না জানি আবার কী চমক অপেক্ষা করছে! তাদের আশা পূরণ করতেই যেন ফের ট্রেনার ঢুকল। এবার তার সঙ্গে দড়িতে বাঁধা এক বিরাট কালো ভাল্লুক।

ট্রেনারের ইঙ্গিতমতো ভাল্লুকটা একটা মস্ত তিনচাকার সাইকেল চেপে চক্কর দিতে লাগল। কিন্তু অধৈর্য দর্শকরা চিৎকার করে জানতে চাইল, “এও মানুষের ভাষা বোঝে নাকি?”

“ইয়েস। হ্যাঁ, বোঝে,” জানাল ট্রেনার, “তবে ব্যাটার বুদ্ধিশুদ্ধি কম। বেশি শিখতে পারেনি। মিস্টার জাম্ববান জোয়ান আদমি। খুব তাকত। রোজ ভোরে ও এক্সারসাইজ করে। আপনারা ওর এক্সারসাইজ দেখতে চাইলে দেখাবে। থামতে বললে থামবে। তবে দয়া করে বেশি খাটাবেন না। তাহলে ওর মেজাজ বিগড়ে যাবে।”

ট্রেনার জাম্ববান নামে ভাল্লুকটির গলা ও নাকের ফুটোয় বাঁধা দড়িটা একটা খুঁটিতে আটকে দিয়ে পিছনে দূরে সরে গেল। অতঃপর হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল দর্শকদের, এবার বলতে পারেন।

“এ বেটা জাম্ববান, থোড়া এক্সারসাইজ দেখলাও।” পঞ্চাশ পয়সার আসন থেকে পালোয়ান গোছের একটি লোকের কণ্ঠ শোনা গেল। জাম্ববান গম্ভীরভাবে মাটিতে উবু হয়ে বসে ছিল। এবার সে তার সামনের ডান হাত (বা পা) তুলে একবার লম্বা করতে লাগল, আবার মুড়তে লাগল। এই রকম করেই চলল।

“ব্যস্‌, ব্যস্‌, ঠিক হ্যায়। লেকিন আউর কুছ কসরত তো

দেখলাও।" মিনিটখানেক বাদেই হুকুমদাতা দর্শক অনুরোধ জানাল।

জাম্ববান এবার তার ঘাড় ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতে লাগল। দর্শকটি খানিক দেখে বলল, "বাহবা বাহবা, বহুত আচ্ছা। ঠিক হ্যায়, আভি রোক্ যা বেটা।"

জাম্ববান অমনি এক্সারসাইজ থামিয়ে শান্ত হয়ে বসে রইল।

ট্রেনার দর্শকদের উদ্দেশে বলল, "মিস্টার জাম্ববান পেয়ারা খেতে খুব ভালবাসে। কেউ ওকে পেয়ারা খাওয়াবে শুনলে ভারী খুশি হয়। আপনারা ওকে পেয়ারা খাওয়াবেন এই কথা বলে দেখুন, কী করে?"

সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারির সেই অতি তৎপর ঢ্যাঙা লোকটি চেঁচাল "এই জাম্ববান—"

কিন্তু ঢ্যাঙার বাকি কথা বার হওয়ার আগেই অপর এক কণ্ঠ শোনা গেল গ্যালারি থেকে, "তোকে পেয়ারা খাওয়াব।"

ঢ্যাঙা মহা চটে কটমট করে দেখতে লাগল চকরাবকরা শার্ট গায়ে ফাজিল ছোকরাকে, যে তার কথায় ভাগ বসিয়েছে।

যাই হোক, কাজ হয়ে গেল। ভাল্লুকটি নেচেকুঁদে গদগদ। দর্শকরা হেসে অস্থির। মাস্টার পটল বলে উঠল, "বেশ, বেশ, এবার থাম বাপধন, খাওয়াবে তো বলেছে।"

জাম্ববানের নাচাকোঁদা থেমে গেল।

মাস্টার পটল গ্যালারির কাছে গিয়ে হাত পেতে খনখনে গলায় বলল, "ও মশায়, পঞ্চাশ পয়সা ছাড়ুন, পেয়ারার দাম। পাঁচজনার সামনে কথা দিয়েছেন। না দিলে কেস করব কিন্তু।"

ঢ্যাঙা চকরাবকরা শার্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ও দেবে।"

চকরাবকরা খেঁকিয়ে উঠল, "ইঃ আবদার, আপনি দিন।"

ঝগড়া লেগে গেল। দু'জনেই বলে, "আমি দেব কেন?"

মাস্টার পটল দু'হাত বাড়িয়ে বলল, "দুজনেই ছাড়ুন দাদা, পঞ্চাশ করে। দুজনেই কথা দিয়েছেন, সব্বাই সাক্ষী।"

দর্শকও পটলের সমর্থনে চেঁচাতে শুরু করল, "দিয়ে দিন পঞ্চাশ পয়সা। দু'জনকেই দিতে হবে। প্রমিস করেছেন। আরে ছি-ছি, পঞ্চাশ পয়সার জন্যে ভাল্লুকের কাছে কথার খেলাপ! মানুষের নাম ডোবালেন মশাই।"

ঢ্যাঙা পয়সা বের করত কি না সন্দেহ। তবে দেখা গেল তার স্ত্রীর মুখ-ঝামটা খেয়ে অগত্যা একটা পঞ্চাশ পয়সা ছুঁড়ে দিল পটলকে। তখন চকরাবকরা শার্টও প্রেস্টিজ রাখতে আর-একটা পঞ্চাশ পয়সা ছুঁড়ল। মাস্টার পটল পঞ্চাশ পয়সা দুটো পকেটে পুরে টুপি তুলে দু'বার সেলাম জানাল। শতরঞ্চির আসন থেকে এক দর্শক হুঁশিয়ার করে দিল, "অ্যাই পটল, জাম্ববানকে পেয়ারা কিনে দিবি ঠিক। পয়সাটা মেরে দিসনি যেন।"

পটল ফ্যাক করে হেসে বলল, "আধাআধি বখরা।"

মামাবাবুর দিকে চেয়ে দেখলাম তিনি ভুরু কুঁচকে দেখছেন। এত রগড়েও মুখে হাসি নেই। কেমন অন্যমনস্ক ভাব। কী ভাবছেন কে জানে!

এর পর লোহার শিক দিয়ে তৈরি ফ্রেম জুড়ে-জুড়ে চটপট একটা গোল উঁচু ঘেরা তৈরি করা হল। একটা খাঁচা টেনে এনে লাগানো হল ঘেরার দরজায়। খাঁচা খুলতে এক সিংহ

বেরিয়ে এসে রিংয়ে ঢুকল। রিং-মাস্টারও ঢুকল ঘেরায়। এখন তার হাতে ছড়ির বদলে একটা চামড়ার লম্বা চাবুক।

সিংহটা খুব বুড়ো। তার গায়ের চামড়া ঢিলে। ঘাড়ের কেশর পাতলা হয়ে গেছে। চলাফেরা ধীর। কয়েকটা খেলা দেখাল সিংহটা। দু'পায়ে দাঁড়ানো। এক টুল থেকে অন্য টুলে লাফ। এই রকম কিছু। কিন্তু দর্শক উসখুস করছে। এসব মামুলি খেলায় তাদের আর মন ভরছে না। তারা জানতে চাইল, এও কি মানুষের ভাষা বোঝে ?

রিং-মাস্টার জবাব দিল, "হ্যাঁ বোঝে, তবে দু-চারটে মাত্র। বয়স হয়ে গেছে তাই শেখার ধৈর্য নেই। কেবল ঘুম মারে। আপনারা ওকে ঘুমোতে অর্ডার করুন, দেখুন কেমন খুশি হয়ে কথা শুনবে।"

"ওর নাম কী ?" দু' টাকার সিট থেকে একজন জিজ্ঞেস করল।

"মহারাজ," উত্তর দিল ট্রেনার।

ট্রেনার রিংয়ের বাইরে গিয়ে সিংহের পিছনে দাঁড়াল। অর্থাৎ, পশুরাজের চোখের আড়ালে গেল।

"মহারাজ, স্লিপ, স্লিপ।" দু টাকার সিট থেকে অর্ডার হল।

"মহারাজ, নিদ্ যা।" দ্বিতীয় কণ্ঠ শোনা গেল।

সিংহটি একটি চওড়া টুলের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে ছিল। কয়েক মুহূর্ত বাদে সে গোটা দুই মস্ত-মস্ত হাই তুলল। তারপর টুল থেকে মাটিতে নেমে দুই থাবা টান করে পেতে তার ওপর মাথা রেখে চোখ বুজল। এবং রীতিমত ভোঁস্-ভোঁস্ করে ঘুমোতে শুরু করল।

আধমিনিটটাক দেখেই ফের হুকুম হল, "মহারাজ গেট আপ্।"

গ্যালারি থেকে একজন ফুট কাটল, "গা তোলো বাবা মহারাজ। এখনই ঘুম কী ? মাত্র সাড়ে ছ'টা বাজে।" হাসির রোল উঠল।

মহারাজ চোখ খুলল। পিটপিট করল। যেন নেহাত অনিচ্ছা উঠতে। রিং-মাস্টার কাছে এসে তাড়া লাগাল, "গেট আপ্ মহারাজ, গেট আপ্।"

তখন মহারাজ গা ঝাড়া দিয়ে ফের টুলে চড়ে বসল। বাজনায় ঝড় তুলে ব্যাণ্ডপার্টি ঝপ্ করে আওয়াজ থামাল। ব্যস্, শো শেষ।

ফেরার পথে সুনন্দ ও আমি উত্তেজিত। সত্যি দারুণ খেলা। সুনন্দ বলল, "মনে হয় যেন ম্যাজিক দেখছি।"

মামাবাবু শুধু একবার মন্তব্য করলেন, "ম্যাজিক-ট্যাজিক নয়, নিশ্চয় কোনও ট্রিক আছে। জন্তু-জানোয়ার মানুষের ভাষা বোঝে ? ইম্পসিবল। শোনো, ওই ট্রেনারটিকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসতে পারো ? ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

এক দিন বাদেই সকালে সুনন্দ জুবিলি সার্কাসের রিং-মাস্টার অর্থাৎ অ্যানিম্যাল ট্রেনারকে আমাদের বাড়িতে এনে হাজির করল। সুনন্দ নাকি সেদিন ভোর থেকে সার্কাসের বেড়ার বাইরে ঘোরাফেরা করছিল। রিং-মাস্টারটি একবার বাইরে আসতেই তার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমায়। এ-ব্যাপারে সুনন্দ ওস্তাদ। তারপর শান্তিনিকেতন দেখানোব ছুতো করে তাকে ঘোরাতে ঘোরাতে একেবারে নিজেদের বাড়িতে কফি খাওয়াবে বলে টেনে এনেছে।

মামাবাবু ও আমি বেরিয়ে এসে রিং-মাস্টারকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালাম। রিং-মাস্টারটির মুখ হাসি-হাসি, মনে হয় ফূর্তিবাজ ধরন। সবাই বসলাম বারান্দায় বেতের চেয়ারে। মামাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নাম ?"

উত্তর এল, "মাইকেল দাস।"

"বাঙালি ?"

"নিশ্চয়। কলকাতায় বাড়ি।"

"সার্কাসে ঢুকেছেন কদ্দিন ?"

"প্রায় সাত বছর।"

"আপনার ট্রেনিং অদ্ভুত। জানোয়ারদের খেলা দেখাচ্ছেন কদ্দিন ?"

"তিন বছর। আগে জিমনাস্টিক্স করতাম।"

"আপনি অ্যানিমাল ট্রেনিং শিখেছেন কার কাছে ?"

"আমার গুরু নায়ারজি'র কাছ থেকে।"

"উনি এই সার্কাসে ছিলেন ?"

"হ্যাঁ। আগে অবশ্য অনেক বড়-বড় সার্কাসে কাজ করেছেন। বয়স হয়ে শরীর খারাপ যাচ্ছিল। তখন এই ছোট দলে আসেন। আমাদের মালিক মুথুস্বামী ওঁর খুব বন্ধু।"

"নায়ারজি এখন কোথায় ?"

"রিটায়ার করে দু-বছর আগে দেশে চলে গেছেন। সার্কাসের ঘোরাঘুরি আর তাঁর শরীরে পোষাচ্ছিল না।"

"এই সব জন্তু-জানোয়ারকে খেলা শিখিয়েছে কে ? নায়ারজি ?"

"হ্যাঁ, এরা নায়ারজির হাতেই তৈরি।"

"মানে এই মানুষের ভাষা বোঝার খেলা, এও কি নায়ারজির শেখানো ?"

মাইকেল দাস কেমন আড়ষ্ট হয়ে মাথা নাড়ল।

"ও, নায়ারজি শেখাননি ! তবে কি আপনি ?"

মামাবাবুর প্রশ্নে দাস মুখ নিচু করে ফের মাথা নাড়ে।

"তাহলে ?"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে দাস বলল, "এসব সাধুজির কৃপা।"

"মানে !" প্রশ্নটা আমাদের তিনজনের গলা দিয়েই একসঙ্গে বেরয়।

"মানে সাধুজির আশীর্বাদে ওরা কিছু-কিছু মানুষের ভাষা বুঝতে পারে। মাপ করবেন, এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারব না।"

মামাবাবু এই নিয়ে আর চাপাচাপি করলেন না। বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও প্রসঙ্গ থাক, আপনি বরং সার্কাসের গল্প বলুন। সার্কাসের লাইফ কেমন জানতে ইচ্ছে করে ?"

মাইকেল দাস সার্কাসের গল্প শুরু করে। ক্রমে বেশ সহজ হয়ে ওঠে। সত্যি বিচিত্র জীবন তাদের। কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সাধারণ লোকের যা ধারণার বাইরে।

কফি ও কেক এল। খেতে খেতে মাইকেল দাসের গল্প চলে। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনি। ঘণ্টাখানেক বাদে সে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

দাস চলে যাওয়ার পর মামাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু, রহস্যটা ক্লিয়ার হল না হে। ও এড়িয়ে গেল। সুনন্দ, অসিত তোমরা সার্কাসটার ওপর নজর রাখবে। দ্যাখো কোনও ক্লু পাও কি না।"

ছবি : দেবাশিস দেব

দু'দিন পরে দুপুরবেলা সুনন্দ বলল, "জানেন মামাবাবু, আজ বাপি রায়কে দেখলাম সার্কাসে।"

"কে বাপি রায় ?" মামাবাবু জানতে চাইলেন।

"সেই যে মেডিকেল কলেজের প্রফেসর, বিখ্যাত নিউরো সার্জন ডক্টর সেনের কাছে রিসার্চ করত। একদিন ডঃ সেনের সঙ্গে এসেছিল আমাদের বাড়িতে। খুব আমুদে।"

"হুঁ মনে পড়ছে," বললেন মামাবাবু, "ডঃ সেন বলেছিলেন, ছেলেটা ব্রিলিয়ান্ট তবে বড্ড খামখেয়ালি। খুব ভাল কাজ করছিল। কিন্তু হঠাৎ রিসার্চ ছেড়ে চলে গেছে। ডঃ সেন আমায় বলেছিলেন যে বাপি নাকি জানিয়েছে যে ও মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভের চাকরি নিয়েছে। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়। বাড়িতে টাকার প্রয়োজন তাই চাকরিটা নিতে হয়েছে। কিছুদিন পরে গিয়ে ফের রিসার্চে ঢুকবে। ডঃ সেন রাগ করেছিলেন, ওঁকে কেন বলল না চাকরি দরকার। তাহলে কলকাতাতেই কিছু একটা জুটিয়ে দিতে পারতেন। চাকরি ও রিসার্চ দুটোই চালাতে পারত। ছেলেটাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ডঃ সেন। কিন্তু ও এড়িয়ে গেছে, আসেনি। তা ও এখানে কী করছে ?"

সুনন্দ জানাল, "বাপি বলল, ও এই সার্কাসে চাকরি নিয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। ওর নাকি সার্কাসের লাইফ খুব ভাল লাগে। খেলাও শিখছে। আরে, প্রথমে তো আমায় যেন চিনতেই পারে না। সকালে বাজারে গিয়েছিলাম। ভাবলাম সার্কাসটা এক চক্কর দেখে যাই। সার্কাসের বাইরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখলাম ওকে। বাপি, বলে ডাকলাম। ও আমার দিকে একবার তাকিয়েই হনহন করে ভিতরে ঢুকে গেল। আমিও ছাড়বার পাত্র নই। লুকিয়ে নজর রাখলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে মূর্তিমান গেটের বাইরে এল। এদিক-সেদিক দেখে গুটিগুটি গিয়ে দাঁড়াল কাছেই একটা সিগারেটের দোকানে। ব্যস, আমিও গিয়ে খপ্ করে ওর হাত চেপে ধরে বললাম, আরে বাপি যে! আর যায় কোথা ? তখন বলে কি না, হ্যাঁ, কে যেন ডাকল মনে হল। আমায় নাকি ও চিনতেই পারেনি। স্রেফ গুল। ইচ্ছে করে কেটে পড়েছিল।"

মামাবাবু কিঞ্চিৎ ভেবে বললেন, "আজ আমি আবার সার্কাস দেখতে যাব ভাবছি। তোমরা কেউ যাবে নাকি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব বইকী।" আমরা দুজন তৎক্ষণাৎ রাজি।

সেদিনও গেলাম পাঁচটার শোয়ে। মামাবাবুর নির্দেশমতো বসলাম চেয়ারে নয়, কাঠের তক্তা পাতা উঁচু গ্যালারিতে। জন্তু-জানোয়ারের খেলা শুরু হতেই দেখি মামাবাবু কাঁধের ঝোলা থেকে একটা দূরবিন বের করে চোখে লাগালেন।

বাঁদরের খেলা হল। কুকুরের খেলার শেষে মামাবাবু বললেন, "সুনন্দ, বায়নাকুলারটা দিয়ে দ্যাখ তো, পর্দার ধারে যে নিচু টুলে বসে, বাপি রায় কি না?"

সুনন্দ দূরবিন দিয়ে খানিক দেখে বলল, "হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। তবে টুপি আর গোঁফ লাগিয়েছে। ওটা ফল্‌স গোঁফ, সকালে দেখিনি।"

সেদিনও প্রত্যেক জন্তুর সাধারণ খেলার শেষে ছিল তাদের মানুষের ভাষা বোঝার চমক! তবে খেলাগুলো কিছু পালটানো হল। সেদিন মিলিটারি বাঁদর মানিকচাঁদকে দর্শকরা 'কুইক মার্চ' অর্ডার দিতেই খুঁটিকে পাক খেয়ে ঘুরতে শুরু করল। এবং হল্ট বলতেই থামল।

দর্শকরা মানিকচাঁদকে ভিতু বা কাওয়ার্ড বলতেই সে বেজায় খেপে গেল। 'দুঃখিত', 'মাপ কিজিয়ে' এবং 'সরি' বলতে তবে শান্ত হল।

কুকুর পঞ্চুকে সেদিন চোর অপবাদ দিয়ে চটানো হল না। ট্রেনারের কথামতো সেদিন পঞ্চুকে এক দর্শক বিস্কুট খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দিতে সে মহা ফুর্তিতে ল্যাজ নেড়ে দু'পা তুলে ঘুরে-ঘুরে নাচ দেখাল। এবং মাস্টার পটল সেই দর্শকের কাছ থেকে বিস্কুটের দাম বাবদ পঞ্চাশ পয়সা তক্ষুনি আদায় করে ছাড়ল। দর্শকদের অনুরোধ বা আদেশমাফিক ভাল্লুক জাম্ববান যথারীতি এক্সারসাইজ দেখাল এবং হুকুম করতেই থামল। সিংহমহারাজও দর্শকদের কথায় মাটিতে শুয়ে নাক ডাকাতে শুরু করেছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ আয়েস করা বেচারার ভাগ্যে নেই। কারণ একটু বাদেই তাকে উঠতে বলায় বাধ্য হয়ে গা তুলল। বোধহয় ভাল্লুক ও সিংহ এর বেশি মানুষের ভাষা বোঝে না।

ফেরার পথে মামাবাবুর মুখ থমথমে। কথা নেই। শুধু একবার বললেন, "বাপি রায়কে একবার আমার কাছে আনতে পারবে? নইলে অবশ্য আমিই যাব ওর কাছে।"

পরদিন সকালেই বাপি রায়কে নিয়ে সুনন্দ হাজির। সহজে তাকে পাকড়াতে পারেনি। কিঞ্চিৎ কৌশল করতে হয়েছিল। অনেকক্ষণ সার্কাসের ঘেরার বাইরে চক্কর মেরেও বাপির দেখা না পেয়ে সে সার্কাসের অন্য একজনকে ধরে। বলে, "আমি ভেটারিনারি হসপিটাল থেকে আসছি। আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিস্টার রায়ের সঙ্গে আপয়েন্টমেন্ট আছে।"

অনেক জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কারবার, তাই সার্কাসওয়ালাদের কাছে ভেটারিনারি হসপিটাল বা পশু হাসপাতালের লোকদের খুব খাতির। ফলে জুবিলি সার্কাসের লোকটি তক্ষুনি সুনন্দকে নিয়ে সোজা হাজির করে বাপির তাঁবুতে। এর পর প্রফেসর ঘোষ ডেকেছেন শুনে বাপি সুড়সুড় করে চলে এসেছে।

বাপির চেহারাটা ছোটখাটো। সুশ্রী মুখ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বেশ স্মার্ট। তবে যেন কিঞ্চিৎ নার্ভাস। আমারই বয়সী। বাপির সঙ্গে সুনন্দ আমার আলাপ করিয়ে দিল।

মামাবাবু বললেন, "বোসো বাপি।" আমরা সবাই বসলাম বৈঠকখানায়।

মামাবাবু গম্ভীর গলায় বাপিকে জিজ্ঞেস করলেন. "এই সার্কাসে কী করছ?"

"আজ্ঞে চাকরি," উত্তর দিল বাপি।

"তুমি না মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভের চাকরি নিয়েছিলে? ডঃ সেন বলেছিলেন আমায়।"

বাপি মাথা চুলকোয়। মুখে কথা নেই।

"জন্তুগুলোর মাথায় ইলেক্ট্রোড বসিয়েছে কে? তুমি?" ঠাণ্ডা গলায় কাটা-কাটা ভাবে মামাবাবুর মুখে এই অদ্ভুত কথা'টি শুনে আমরা চমকে উঠলাম। বাপির চোখ বড়-বড়, ঢোঁক গিলছে।

মামাবাবু আবার বললেন, "তুমি বুঝি ওদের ব্রেন স্টিমিউলেট করছ রিমোট কন্ট্রোলে? আর ভাষা বোঝার খেলা দেখাচ্ছ?"

বাপি হতাশভাবে বলে উঠল, "হুঁ কট্। কাল আপনাকে বায়নাকুলার হাতে দেখেই ভয় হয়েছিল, হয়তো ধরা পড়ে যাব।"

"হঠাৎ এই মতলব হল কেন?" মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে সে অনেক ব্যাপার।" বাপি করুণ মুখে উত্তর দিল।

"শুনি কী রকম?" বললেন মামাবাবু।

বাপি একটু ইতস্তত করে শুরু করল, "আজ্ঞে, আপনি তো জানেন ডক্টর সেনের কাছে আমার রিসার্চের বিষয়টা?"

"খানিকটা শুনেছিলাম," বললেন মামাবাবু।

"আমার রিসার্চ ছিল ব্রেনের বিভিন্ন নার্ভ সেণ্টারগুলো খুঁজে বের করা। স্নায়ুকোষের নানান কাজের ফলে যে সব ইলেকট্রিক্যাল ইমপাল্‌সের সৃষ্টি হয়, তা পরীক্ষা করা এবং বাইরে থেকে পাঠানো ইলেকট্রিক্যাল ইমপালসের সাহায্যে ওই সমস্ত নার্ভ সেণ্টারগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে স্টিমিউলেট করা। জন্তু-জানোয়ার নিয়েই বেশির ভাগ এক্সপেরিমেণ্ট করছিলাম। ভাবলাম, আমার বিদ্যেটা একটু হাতে-কলমে কাজে লাগাই।"

"তা এই সার্কাসে জুটলে কী ভাবে?" জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু।

"আজ্ঞে, এই জুবিলি সার্কাসের মালিক-কাম-ম্যানেজার মুথুস্বামীর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। যে লোকটি জাগলিং আর মাছসুদ্ধু জল খাওয়ার খেলা দেখায়, ওই মুথুস্বামী। বছর পাঁচেক আগে সোদপুরে আমার মামারবাড়ির কাছে যখন ওরা শো দিতে গিয়েছিল তখন পরিচয় হয়। সার্কাস আমার দারুণ ভাল লাগে। সুযোগ পেলেই তাই সার্কাসের লোকদের সঙ্গে ভাব জমাই। মুথুস্বামীর সঙ্গে ফের দেখা হল বছর-দেড়েক আগে ওই সোদপুরে। ওরা আবার খেলা দেখাতে এসেছিল। মুথুস্বামী দুঃখ করে বলল যে, তার সার্কাসের হাল খুব খারাপ। টিকিট বিক্রি কমে গেছে। পয়সার অভাবে নতুন সাজ-সরঞ্জাম কিনতে পারছে না। ভাল নতুন আর্টিস্ট আনতে পারছে না। নতুন তেজি পশুপাখি কেনার পয়সা নেই। ঠিকমতো মাইনে দিতে না পারায় কয়েকজন ভাল খেলোয়াড় অন্য সার্কাসে চলে গেছে। বাজারে ধার জমেছে। এরকম চললে সার্কাস বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তখনই আমার মাথায় এই আইডিয়াটা আসে। মুথু একটু দোনামনা করে রাজি হয়ে গেল আমার কথায়। কী করবে, বেচারার তখন নিরুপায় অবস্থা।

তা আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেস্‌ফুল। টিকিট সেল খুব বেড়েছে। ধার শোধ হয়ে গেছে। মুথুস্বামীর হাতে এখন দু-পয়সা জমেছে। এবার ওর সার্কাসের চেহারা ফিরে যাবে।

"ইলেক্‌ট্রোডগুলো জন্তুগুলোর রঙের সঙ্গে মিলিয়ে এমন ভাবে রাখা আছে যাতে দূর থেকে দেখলে মোটেই ধরা না যায়। তবে আপনার ট্রেণ্ড চোখ, আবার বায়নাকুলার দিয়ে দেখলেন। এই ভয়েই বড় শহরে খেলা দেখাতে যাইনি। পাছে আপনাদের মতো সায়ান্টিস্টদের কাছে ধরা পড়ে যাই।" বাপি ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

"তুমি কি সারাজীবন এই করবে?" মামাবাবু কড়া গলায় জানতে চাইলেন।

"না, না, তা কেন করব," বাপি আপত্তি জানাল, "এক বছরের কন্ট্রাক্ট। আর তিন মাস বাকি। ব্যস্‌, তারপরে আমার ছুটি। ফের তখন ডঃ সেনের কাছে রিসার্চে ঢুকব। তবে সার্কাসের লাইফটা কিন্তু ভারী ইন্‌টারেস্টিং।"

"প্লিজ একটু বুঝিয়ে বলবেন," আমি আর ধৈর্য রাখতে পারি না। "জন্তুগুলোর ভাষা বোঝার খেলার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?"

বাপি সপ্রশ্নভাবে মামাবাবুর দিকে চাইল। মামাবাবু বললেন, "দাও বুঝিয়ে, তবে অল্প কথায়।"

"অলরাইট," বাপি নিজের মাথায় একটা টোকা দিয়ে বলল, "এই হচ্ছে আমাদের মস্তক, মানে মাথা। এই মাথার নীচে আছে ব্রেন, মানে মগজ। অতি রহস্যময় এবং দরকারি বস্তু। এর জোরেই আমরা করে খাই। মগজে আছে কোটি কোটি নিউরোন অর্থাৎ স্নায়ুকোষ। মগজের ভিতরে এক-এক জায়গাকার স্নায়ুকোষের কাজ এক-এক রকম। মগজের এই স্নায়ুকোষগুলির নির্দেশেই আমরা এক-এক ধরনের কাজ করি।

"বাইরের পরিবেশে কত রকম ঘটনা ঘটছে, সেই সব খবর আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে এবং স্নায়ুতন্ত্র মারফত তা ক্রমাগত ব্রেনে গিয়ে পৌঁছয়। জানেন তো, আমাদের শরীরে প্রায় সব জায়গাতেই আছে স্নায়ুকোষ এবং স্নায়ুকোষগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। মগজ বা মস্তিষ্কই হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান। কোনও খবর আমাদের মগজে পৌঁছনোমাত্র মগজ ঠিক করে ফেলে এর ফলে আমাদের শরীরে কী কী প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত এবং সেই অনুযায়ী নির্দেশ দেয়।

"যেমন ধরুন, চোখে একটা কিছু দেখলাম। চোখের স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে সেই ঘটনা পৌঁছে যাবে মগজে। মগজ হয়তো তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেলবে যে, এই দৃশ্য দেখে আমার চটে যাওয়া উচিত। অমনি ব্রেনের যে স্নায়ুকোষগুলি রাগকে চালনা করে সেই কোষগুলি স্টিমিউলেটেড হবে, অর্থাৎ উদ্দীপিত হয়ে উঠবে এবং ওই কোষগুলি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাবে। যেমন ধরুন, আমার শরীর হয়তো গরম হয়ে উঠবে, হয়তো আমার চোখ বড় বড় হবে বা পেশী শক্ত হয়ে উঠবে।

"আবার যদি দৃশ্যটায় আনন্দ হওয়া উচিত বলে মনে করে ব্রেন, তাহলে প্লেজার সেণ্টার বা স্ফূর্তির কেন্দ্রে খবর যাবে। প্লেজার সেণ্টারের স্নায়ুকোষগুলি উদ্দীপিত হবে এবং তাদের নির্দেশে আমি স্ফূর্তির লক্ষণ দেখাব। যেমন, হাসতে পারি দাঁত বের করে, বা হো-হো করে। হয়তো আনন্দে গড়াগড়ি

খাব, বা কুকুর হলে লেজ নাড়ব। সবই হবে আমার প্লেজার-সেণ্টারের স্নায়ুকোষদের হুকুমে।

"মনে রাখবেন, বাইরের পরিবেশের প্রভাব ছাড়াও ব্রেন আমাদের চালায়। যদি সে মনে করে আপনার এখন ডান হাতখানা নাড়ানো উচিত, অমনি যে স্নায়ুকোষগুলি আপনার ডানহাতখানা চালনা করে, সেগুলি উত্তেজিত হয়ে নির্দেশ পাঠাবে এবং আপনিও আপনার ডান হাত নাড়াতে শুরু করবেন। নির্দেশ পাঠানো বন্ধ হলেই হাত নাড়া থেমে যাবে।

"এই ভাবে ব্রেনের স্নায়ুকোষ আমাদের চালায়। এখন পরীক্ষা করে জানা গেছে, প্রাণীর স্নায়ুকোষ উদ্দীপিত হলেই তাতে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। এবং তার ফলে সেখানে ইলেকট্রিক্যাল ইমপাল্‌স অর্থাৎ বৈদ্যুতিক স্পন্দন সৃষ্টি হয়। খুব সূক্ষ্ম সেই স্পন্দন। এই বৈদ্যুতিক স্পন্দন বা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ স্নায়ুতন্ত্রের পথ বেয়ে ছুটে চলে।

"দেখা গেছে, মানুষ এবং উন্নত প্রকারের মেরুদণ্ডী প্রাণীর মগজের গঠন প্রায় একই রকম। বৈজ্ঞানিকরা খুঁজে দেখছেন, নানারকম প্রাণীর মগজের কোন্ কোন্ অঞ্চল কী কী কাজ করে। ব্রেনের কোন্ কোন্ জায়গাকার নিউরোন স্টিমিউলেটেড হলে কী ধরনের কারেণ্ট তৈরি হয়। তবে উন্নত প্রাণীর ব্রেনের বহু অংশের কাজই এখনও আমাদের অজানা। আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে।

"বৈজ্ঞানিকরা প্রাণীদের মগজের নানা অনুভূতির কেন্দ্র, যেমন স্ফূর্তি, খিদে, রাগ, বেদনা, ঘুম ইত্যাদির নার্ভ-সেণ্টারগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে স্টিমিউলেট করতে চেষ্টা করছেন। ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন নয়। খুলি ফুটো করে খুব সরু একটা ইলেকট্রোডের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক কারেণ্ট পাঠাতে হবে। বিশেষ শক্তির বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। তাহলেই যেখানে ইলেকট্রোডের ডগাটা ছুঁয়েছে সেখানকার স্নায়ুগুলি স্টিমিউলেটেড হবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাবে। আবার কারেণ্ট পাঠানো বন্ধ করলেই কোষগুলি নিস্তেজ হয়ে পড়বে এবং নির্দেশ পাঠানো বন্ধ হবে। আমার সার্কাসের এক্সপেরিমেণ্টও এই কায়দায় হচ্ছে।"

এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিলাম এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক বিবরণ। এবার জিজ্ঞেস করলাম, "ইলেকট্রোড কী?"

বাপি একটা লম্বা দম নিয়ে মামাবাবুর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলল, "উঃ, গলাটা শুকিয়ে গেছে। একটু চা-টা যদি—"

মামাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। দ্যাখো কাণ্ড, খেয়ালই নেই। সুনন্দ, যাও তো একটু ব্যবস্থা করো।"

সুনন্দ ভিতরে উঠে গেল।

চা-টায়ের আশ্বাসে খুশি হয়ে বাপি আমার দিকে ফিরে বলল, "ইলেকট্রোড কী জানেন, সোজা কথায় খুব সরু শক্ত বিদ্যুৎ পরিবাহী তার। তারের গা-টা ইনসুলেটেড করা। কেবল ডগায় একটু চেঁছে ধাতু বের করা। তারের অন্য প্রান্তের সঙ্গে যোগ থাকবে ব্যাটারির। ইলেকট্রোডের ডগাটা ব্রেনের যে অনুভূতির কেন্দ্রকে চাগাতে চাই সেখানটা ছুঁয়ে থাকবে।"

সার্কাসের জানোয়ারদের মানুষের ভাষা বোঝার খেলার রহস্যটা এবার আমার কাছে খানিক পরিষ্কার হল। বললাম, "আচ্ছা সার্কাসের ভাল্লুকটা যে ঘাড় নাড়ল, হাত নাড়ল সেটা কি ওই?"

বাপি হেসে বলল, "হ্যাঁ, ওই ইলেকট্রোডের মহিমায়।"

"আচ্ছা বাঁদরটা কেন হঠাৎ কলা খাওয়া থামাল?" প্রশ্নটা সুনন্দর। সে ইতিমধ্যে চায়ের ব্যবস্থা করে ফিরে এসেছিল।

বাপি বলল, "ওর খিদে মিটে যাওয়ার নার্ভ-সেণ্টার চাগিয়ে দিতেই ও খাওয়া থামায়। আবার হাঙ্গার-সেণ্টারকে স্টিমিউলেট করলেই খেতে চায়।"

"আর কুকুরটা যে চটে গেল?" সুনন্দর কৌতূহল মেটেনি।

"নিজে থেকে চটেনি। আমিই চটিয়ে দিয়েছিলাম কৃত্রিম উপায়ে। ওর রাগের কেন্দ্রে ইলেকট্রোডের সাহায্যে ইলেকট্রিক কারেণ্ট পাঠিয়ে। আবার কারেণ্ট অফ করতেই শান্ত হয়ে গেল।"

মামাবাবু বললেন, "হুম। আমি বায়নাকুলার দিয়ে ওই কুকুরটার মাথাতেই একটা তার আটকানো দেখে ইলেকট্রোড বলে সন্দেহ করেছিলাম। তা ওটা চার্জ করার ব্যাটারিটা কোথায় ছিল? বকলসের গায়ে?"

"আজ্ঞে ঠিক ধরেছেন।" জবাব দিল বাপি।

চণ্ডী ট্রে হাতে ঢুকল ঘরে। ট্রে রাখা হল সামনের টেবিলে। তাতে চার কাপ চা। একটা প্লেটে দু-টুকরো বড়-বড় কেক। এবং আরেকটা প্লেটে অনেকখানি চানাচুর।

বাপি সঙ্গে সঙ্গে একটা কাপ টেনে নিয়ে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে গোটা একখানা কেক তুলে মুখে পুরল। মামাবাবু বললেন, "খাও খাও, কেক-টেক তোমার জন্যে। আমরা শুধু চা খাব।" ব্যস, বাপির কথা বন্ধ, মুখ ভর্তি। বোঝা গেল সে আর বৈজ্ঞানিক লেকচারে রাজি নয়।

মামাবাবু বললেন, "আমি একবার সরেজমিনে দেখতে চাই ব্যাপারটা। এখন নিয়ে যেতে পারবে তোমাদের সার্কাসে? এখন তো খেলার টাইম নয়।"

চানাচুর চিবুতে চিবুতে বাপি ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

জুবিলি সার্কাসের সামনে আমরা চারজন যখন সাইকেল-রিকশা থেকে নামলাম তখন সকাল প্রায় দশটা। বাপি আমাদের নিয়ে গেট খুলে খেলা দেখাবার বড় তাঁবুর ভিতর দিয়ে সোজা চলল। দুটি ছেলেমেয়ে তখন তাঁবুতে একচাকার সাইকেলের কসরত অভ্যাস করছিল। আরও দুটি লোক ঠকাঠক শব্দে গ্যালারির তক্তা পেটাচ্ছিল। তারা নিজেদের কাজ ফেলে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। বাপির দৃক্‌পাত নেই। আমরা বাপির পিছনে পিছনে হেঁটে তাঁবুর অন্য ধার দিয়ে বেরুলাম। এটা সার্কাসের পিছন দিক। এখানে সারি-সারি ছোট-ছোট তাঁবু। উনুনের ধোঁয়া উড়ছে। ঘরোয়া বেশে একটি মেয়ে মাটিতে চট পেতে বসে কী জানি সেলাই করছে। সার্কাসের স্ট্রংম্যান মিঃ ভীম, লুঙ্গি ও গেঞ্জি গায়ে একখানা ভিজে গামছা শুকোতে দিচ্ছে দড়িতে। এখানে-ওখানে জন্তুদের খাঁচাগুলো।

বাপি আমাদের নিয়ে কাছেই একটা তাঁবুর সামনে হাজির হল। তাঁবুর পর্দা তোলা। দেখলাম মুথুস্বামী ভিতরে চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা একটা মোটা খাতায় কিছু লিখছে ঝুঁকে। তাঁবুর ভিতরে আরও কয়েকখানা চেয়ার। আমাদের পায়ের শব্দে মুথুস্বামী চোখ তুলে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল। আমাদের

একটু অপেক্ষা করতে বলে বাপি ঢুকে গেল তাঁবুতে।

মুথুস্বামীর সঙ্গে বাপি কী সব কথা বলল, আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে। মুথুস্বামী হন্তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে এসে আমাদের বলল, "গুড মর্নিং জেন্টেলমেন" এবং হ্যাণ্ডশেক করল আমাদের সবার সঙ্গে। তারপর সে মামাবাবুকে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, "আপনারা এই টেন্টে বসুন। এটায় জায়গা বেশি। এটা আমার অফিস। আমি আসছি।" এই বলে সে অত্যন্ত বিনীত ভাবে হেসে বিদায় নিল।

তাঁবুতে ঢুকে বসলাম চেয়ারে। মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন বাপিকে, "কী বললে তুমি আমাদের সম্বন্ধে?"

বাপি হেসে বলল, "বললাম, আপনি আমার এক্স প্রফেসর। নামকরা সায়ান্টিস্ট। আর অন্য দুজন আমার ক্লাসমেট ছিল। আপনারা সার্কাস দেখতে এসে জন্তুদের ভাষা বোঝার রহস্যটা ধরে ফেলেছেন এবং আমার এক্সপেরিমেন্টটা দেখতে চান। আমি আসছি এক্ষুনি।" এই বলে বাপি উধাও হল।

মিনিট দু-তিন বাদেই বাপি ফিরে এল, সঙ্গে কুকুর পঞ্চু। পঞ্চুকে আমাদের মাঝখানে রেখে নিচু হয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে বাপি বলল, "এই দেখুন।" বলতে বলতেই সে চকিতে মাথা তুলে এক ধমক— "এই পটল, এখানে কী? ভাগ।"

আমরাও ফিরে দেখি, তাঁবুর দরজায় মাস্টার পটল উঁকি দিচ্ছে।

পটলের মুখে তখন রঙচঙ নেই। মাথায় টুপি বা হাতে কাঠটাও নেই। খালি পা। তবে ঢলঢলে পোশাকটা একই রকম। পটল তার বোঁচা নাক ও কুতকুতে চোখ কুঁচকে ঝট করে এক স্যালুট ঠুকে আমাদের দেখিয়ে বলল, "সিনেমার লোক বুঝি? তা স্যার শুধু পঞ্চুকে কেন, আমাকেও নিন। ফাইটিং হিরো। বই বেরুলেই হিট। দেখবেন সব হলে টিকিট ব্ল্যাক হবে।" এই বলে সে হাত-পা ছুঁড়ে এক রাউণ্ড ফাইট দেখিয়ে দিল।

বাপি তাড়া লাগাল, "পটল জ্বালাস্‌নে। পালা বলছি। নইলে টঙে তুলে দেব। ডাকছি মাইকেলকে।"

শুনেই "উরে পিছিমা গো," বলে পটল পাঁই পাঁই করে মারল দৌড়।

"টঙ কী?" আমি জানতে চাইলাম।

"একটা খুব উঁচু টুল। পটলকে জব্দ করতে হলে ওর ওপর চড়িয়ে দেওয়া হয়। বেচারা আর নামতে পারে না। শাস্তিটা রিং-মাস্টার মাইকেলের আবিষ্কার। পঞ্চুকে একবার সিনেমায় অ্যাকটিং করতে নিয়েছিল। সেই থেকে পটল পিছনে লাগে। আসলে ও পঞ্চুকে খুব ভালবাসে। ওর কাছ থেকে পঞ্চুকে নিয়ে এলাম, তাই কৌতূহলে দেখতে এসেছে।"

আমরা এবার মন দিয়ে পঞ্চুকে দেখতে থাকি। বাপি পঞ্চুর মাথা ও ঘাড়ের লোম ফাঁক করে দেখাল, "এই যে ইলেকট্রোডের তার।"

দেখলাম, সাদা রঙের খুব সরু কয়েকটা তার পঞ্চুর মাথা থেকে নেমে এসে তার দু-ভাঁজ বকলসের ভিতর ঢুকে গেছে।

"এ যে অনেকগুলো তার," বলল সুনন্দ।

"হ্যাঁ, তিনটে। কারণ ওর মাথায় তিনটে ইলেকট্রোড বসানো আছে। তিন জায়গার নার্ভ-সেণ্টার ছুঁয়ে আছে। বকলসে আটকানো ব্যাটারির সঙ্গে একটা করে ইলেকট্রোডের তার যোগ করা আছে।"

"মানে তিনটে ইলেক্‌ট্রোডের সঙ্গে তিনটে ব্যাটারি।" সুনন্দ জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, খুব ছোট-ছোট ব্যাটারি।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "এই ভাবে ইলেকট্রোড বসানো থাকলে প্রাণীর ব্যথা লাগে না?"

"মোটেই না," বলল বাপি, "যখন খুলি ফুটো করে বসানো হয় তখন তাকে অজ্ঞান করে নেওয়া হয়। ইলেক্‌ট্রোডগুলো এত সরু যে প্রাণী তাদের অস্তিত্ব টেরই পায় না। একই প্রাণীর ব্রেনে একসঙ্গে কয়েকটা ইলেক্‌ট্রোড বসানো থাকলেও তার ব্রেনের ক্ষতি হয় না। এবং অনেকদিন এইভাবে রাখা যায়।"

মামাবাবু এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার প্রশ্ন করলেন, "ডক্টর সেন, মানে তোমরা মানুষের ব্রেনে ইলেক্‌ট্রোড বসিয়েছ কখনও?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," বলল বাপি, "মাত্র দু-বার। জানেন তো মানুষের মাথায় ইলেকট্রোড বসানো কী ঝামেলা। এক্সপেরিমেণ্টের জন্য লোকই পাওয়া যায় না। আমরা সাধারণত উন্নত ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণী, যেমন, বাঁদর, বেড়াল, কুকুর এইসব নিয়েই পরীক্ষা করতাম। ওদের মস্তিষ্কের গঠন প্রায় মানুষেরই মতন। এই জন্যেই তো সার্কাসে খেলা দেখানোয় সুবিধে হয়ে গেল।" একটু দুষ্টু হাসল বাপি।

"হুম," মাথা নেড়ে মামাবাবু বললেন, "তুমি তো রিমোট-কন্ট্রোল করো, কীভাবে? তাহলে তো ট্রান্সমিটার চাই।"

"হ্যাঁ, ওই যে ট্রান্সমিটারটা, তাঁবুর কোণে চৌকির ওপর, ঝালর-লাগানো পাতলা কাপড়ে ঢাকা। ওটা খেলার সময় রিংয়ের ঠিক ধারে মাটিতে রাখা থাকে। লোকে বুঝতে পারে না জিনিসটা কী। ট্রান্সমিটারের সঙ্গে কয়েকটা ইলেকট্রিক তার লাগানো। ওই দেখুন গুটনো তার। তারগুলো এক খণ্ড কাঠের গায়ে আটকানো কয়েকটা সুইচের সঙ্গে যোগ করা। ওই যে সুইচ-বোর্ড। খেলার সময় সুইচ-বোর্ডটা থাকে দূরে আমার কাছে। আর ইলেকট্রিক তারগুলো মাটিতে এমনভাবে বিছানো থাকে যাতে করে দর্শকের নজরে না পড়ে। আর পড়লেই বা কী? ওর আসল উদ্দেশ্য কার মাথায় আসবে? আমি সুইচ টিপে ট্রান্সমিটার কন্ট্রোল করি। সুইচ্‌ অন করলে ট্রান্সমিটার থেকে রেডিও-ওয়েভ পাঠানো যায়। জন্তুদের বকলসের ভিতর ব্যাটারির সঙ্গে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে ওই ওয়েভ ধরা পড়ে এবং বেতার-তরঙ্গ বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে ইলেকট্রোডের মাধ্যমে মগজের অনুভূতি কেন্দ্রে গিয়ে ঘা দেয়।"

মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আলাদা আলাদাভাবে ইলেকট্রোডগুলো চালু করো কী ভাবে?"

বাপি বলল, "রেডিও-ওয়েভ লেংথ্‌ চেঞ্জ করে। আমি আলাদা আলাদা সুইচ্‌ টিপলে আলাদা আলাদা লেংথের রেডিও-ওয়েভ ট্রান্সমিটার থেকে বার হয়। এবং ব্যবস্থামতো এক-একটা ইলেক্‌ট্রোড এক-একরকম রেডিও ওয়েভ লেংথে চালু হয়। সুইচ্‌ বন্ধ করলে ইলেক্‌ট্রোডও অফ্‌ হয়ে যায়।"

মামাবাবু বললেন, "এমন আশ্চর্য যন্ত্রটা বানাল কে? তুমি না ডক্টর সেন?"

বাপি বলল, "আজ্ঞে স্যারের কাছ থেকেই শিখেছিলাম

মেকানিজম্‌টা। উনি সুইডেনের এক বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে যন্ত্রের ডিজাইনটা জেনে এসেছিলেন।"

মামাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "এই সিক্রেট তুমি এভাবে সার্কাসের খেলায় লাগাচ্ছ জানলে ডঃ সেন কি খুব খুশি হবেন?"

বাপি একেবারে মামাবাবুর পায়ের কাছে হামলে পড়ল, "প্লিজ প্রফেসর ঘোষ, দয়া করে স্যারকে বলবেন না এই সার্কাসের কথা। এ-বিদ্যে আমি আর কাউকে শেখাইনি। সার্কাসের লোকে কেউ-কেউ জানে এটা একটা বৈজ্ঞানিক কৌশল। ব্যস, ওই পর্যন্ত। এর মাথামুণ্ডু কিছু বোঝে না। আবার কেউ ভাবে এটা ভুতুড়ে অলৌকিক ব্যাপার। ভয়ে তারা বাক্সটা ছোঁয় না অবধি। মুথুস্বামীর কড়া নিষেধ আছে এ-সম্বন্ধে একটি কথাও যেন কেউ বাইরে ফাঁস না করে। সার্কাসের প্লেয়ারদের মধ্যে ওর ছেলে, মেয়ে, জামাই, ভাইপো এমন আত্মীয়র সংখ্যাই বেশি। এবং সবাই খুব বিশ্বাসী। সার্কাসের সবাই বোঝে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে সার্কাসের সর্বনাশ হবে, ফলে তাদেরও রুজি নষ্ট হবে।"

"ডঃ সেন এই এক্সপেরিমেণ্টটা করছিলেন কেন? ডাক্তারিতে কি কাজে লাগবে?" জিজ্ঞেস করল সুনন্দ।

বাপি বলল, "অনেক অনেক কাজে। এর বিরাট ফিউচার। যেমন ধরো, একজন মানসিক রুগি সর্বদা বিষণ্ণ। অর্থাৎ তার ব্রেনে ফুর্তি বা আনন্দের উৎস যে নার্ভ-সেণ্টার সেটা ঠিকভাবে কাজ করছে না। বাইরে থেকে যদি কৃত্রিম উপায়ে ওই স্নায়ুগুলোকে চাঙ্গা করা যায়, তাহলে রুগি তার মনের ফুর্তি ফিরে পাবে। সুস্থ হয়ে উঠবে।

"আবার পশুদের ওপর এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখা গেছে যে, রাগ ভয় উত্তেজনা অতিরিক্ত হলে তাদের শরীরে নানা রকম রোগ দেখা যায়। মানুষের বেলাতেও ওই একই ব্যাপার ঘটে। তাই আমি সার্কাসের জন্তুদের বেশি রাগাতে বা উত্তেজিত করতে চাই না। যাহোক, এই ধরনের রোগ হবার কারণটা বোঝা গেলে, ওষুধ দিয়ে তার মানসিক উত্তেজনা কমিয়ে স্নায়ু সুস্থ করে তুললে, রোগও ভাল হয়ে যাবে। এছাড়াও আরও অনেক সম্ভাবনা আছে। পৃথিবীর নানান জায়গায় এই নিয়ে রিসার্চ চলছে।"

তাঁবুর দরজায় মুথুস্বামী দেখা দিল। পিছনে একটি লোকের হাতে ট্রে-তে সাজানো পাঁচ কাপ গরম কফি। ট্রে রাখল টেবিলে। মামাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আহা এখন কফি কেন? ছি-ছি অসময়ে হাঙ্গামা।"

মুথুস্বামী বলল, "প্লিজ কফি খান। আমি শুনেছি আপনি একজন ফেমাস্‌ সায়াণ্টিস্ট। সায়াণ্টিস্টদের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।" সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বাপির দিকে তাকাল। বাপি খোশমেজাজে মাথা নেড়ে তক্ষুনি এক কাপ কফি তুলে নিল। মুথুস্বামীও আমাদের সঙ্গে কফি পান করতে বসল। বৈজ্ঞানিক আলোচনার ওখানেই ইতি। বাপি ইঙ্গিত করতে ট্রে-বাহী লোকটি পঞ্চুকে নিয়ে চলে গেল।

কফি খেয়ে তাঁবু থেকে বেরুতেই দেখি মাইকেল দাস দূরে দাঁড়িয়ে। সে আমাদের দিকে চেয়ে একবার হাসল। ও হয়তো বুঝতে পেরেছিল আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য। মাইকেল কিন্তু কাছে এগিয়ে এল না। বোধহয় ওর সঙ্গে যে আমাদের আলাপ হয়েছে তা মুথুস্বামী বা বাপির সামনে প্রকাশ করতে

নারাজ। আমরাও পরিচয়টা চেপে গেলাম।

গেট থেকে বিদায় নেবার মুখে মুথুস্বামী বলল, "মিস্টার রায়ের এক্সপেরিমেণ্টের কথাটা আপনারা বাইরে প্রকাশ করবেন না, প্লিজ। তাহলে আমাদের সার্কাসের খুব লোকসান হবে, বুঝতেই পারছেন—"

মামাবাবু আশ্বাস দিলেন, "না না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

আমরা রিক্‌শায় ওঠার সময় বাপি হেসে বলল, "যাক বাঁচলাম, ভয় হচ্ছিল স্যারকে বুঝি বলে দেবেন গিয়ে।"

"হুঁ, তাই দেব," মামাবাবু ধমকালেন, "সার্কাসে আর তুমি বেশি দিন থাকলে ঠিক জানিয়ে দেব ডঃ সেনকে।"

বাপি হাত কচলাতে কচলাতে বলল, "আর তিন মাস। ব্যস, তারপর আর একটা দিনও নয়। ফিরে গিয়ে স্যারের কাছে তেড়ে রিসার্চে লাগব। কথা দিচ্ছি।"

"ঠিক আছে, আমিও খোঁজ রাখব।" মামাবাবু ওয়ার্নিং দিলেন।

আরও চারটে দিন কেটে গেল। সার্কাসের দিকে আর যাইনি। বাপির সঙ্গেও আর দেখা হয়নি। পঞ্চম দিন সকালে বাপি আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। দু-একটা দায়সারা কথার পর চোখ মিটমিট করে বলল, "আপনারা আজ একবার সার্কাসে চলুন। একটা মজা হবে। লাস্ট শো আটটায়, যাবেন।"

"কী মজা?" জানতে চাইলাম।

বাপি রহস্যময় ভাবে বলল, "হেঁ-হেঁ, সেটা এখন বলব না, পরে। যাবেন কিন্তু। নইলে খুব মিস্‌ করবেন।"

অবশ্যই সেদিন আমরা গেলাম সার্কাসে, আটটার শোয়ে।

বসলাম দু-টাকার সিটে। দেখলাম রাতের শোয়েও দর্শকের ভিড় বেশ। বোধহয় আজব খেলার খবরটা খুব ছড়িয়েছে।

খেলা যথারীতি শুরু হল। লক্ষ করলাম, দু-টাকার সিট থেকে বেশ খানিক তফাতে, এক টাকার গ্যালারি যেখানে শেষ হয়েছে তার কাছে খেলা দেখাবার গোল ঘেরা জায়গা অর্থাৎ রিংয়ের ঠিক ধারে দু'জন লোক পাশাপাশি চেয়ারে বসে। লোকদুটি অচেনা। একজনের গায়ে ছাইরঙা স্যুট। বেঁটেখাটো ভারী চেহারা, মোটা গোঁফ। অপরজনের পরনে হলুদ রঙের স্পোর্টস গেঞ্জি, কালো ট্রাউজার্স এবং মাথায় সাদা কাউন্টি ক্যাপ। এই লোকটি মাথায় লম্বা, দোহারা শক্ত গড়ন। দু'জনেই মাঝবয়সী এবং ভারিক্কি ধরন। মনে হল লোকদুটি হোমরা-চোমরা কেউ হবে। নইলে অমন রিংয়ের ধারে আলাদা করে বসাবে কেন? কাপড়ে ঢাকা ট্রান্সমিটারের বাক্সটাও দেখলাম। রিং ঘেঁষে মাটিতে রাখা।

খেলা চলতে চলতে বাঁদর মানিকচাঁদের খেলা শুরু হল। আজ সে দর্শকদের অনুরোধে লেজ নাড়া দেখাল এবং থামতে বলা মাত্র থামল। এইসময়ে দেখি মুথুস্বামী এসে আলাদা চেয়ারে বসা লোকদুটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কী জানি কথা বলল দুজনের সঙ্গে। তারপর মুথুস্বামী চলে গেল তাঁবুর বাইরে। এবং ট্রেনার মাইকেল দাস মানিকচাঁদের থেকে খানিক তফাতে গিয়ে দাঁড়াল।

এবার টুপি-পরা লোকটি চেয়ারে বসে বসেই একটু ঝুঁকে নিচু গলায় কিছু বলল মানিকচাঁদকে। অমনি বাঁদরটা রেগে দাঁত খিচোতে খিচোতে খুঁটি ধরে ঝাঁকাতে লাগল। কাউন্টি-ক্যাপ চমকে পিছিয়ে বসলেন। তাঁর মুখ নড়ছে। মনে

হল কিছু বলছেন। ফের মানিকচাঁদ শান্ত। বোধহয় বেগতিক বুঝে ক্যাউন্টি-ক্যাপ মাফ চেয়ে নিয়েছেন মানিকচাঁদের কাছে। বাঁদরের খেলা আর হল না। মানিকচাঁদ ফিরে গেল। সেই স্পেশাল দর্শক দুজন গুম মেরে বসে রইলেন।

বাপিকে দেখলাম তাঁবুর গা ঘেঁষে ভালমানুষের মতো একটা টুলে বসে রয়েছে। কে বলবে, উনিই এই রহস্যের আসল মেঘনাদ।

পঞ্চু কুকুর এল। অন্যান্য খেলা দেখানোর পর সেও দেখাল মানুষের ভাষা বোঝার কেরামতি। এবারও সেই কাউন্টি-ক্যাপ পরা দর্শকটি কিছু বলল পঞ্চুর উদ্দেশে। অমনি পঞ্চু রাগে গরগর করে উঠল। কাউন্টি-ক্যাপ আবার কিছু বলামাত্র পঞ্চু ঠাণ্ডা। বিশিষ্ট দর্শক দুজন পরস্পর চোখাচোখি করলেন।

ভাল্লুক জাম্ববানের খেলার সময়ও সেই একই ঘটনা। তবে এবার ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ গুরুতর দাঁড়াল।

জাম্ববান নিজের খেলা অর্থাৎ দর্শকদের কথামতো এক্সারসাইজ দেখানো শেষ হলে লক্ষ করলাম মুথুস্বামী এসে ওই দুই খাতিরের দর্শককে কিছু বলল। দুজনের মধ্যে স্যুট-পরা রাশভারী লোকটি এরপর হাত নেড়ে কী সব ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাইকেল সমেত সার্কাসের সব লোকজন চলে গেল খেলার তাঁবুর বাইরে। বেঁটে জোকার মাস্টার পটলও একছুটে পালাল। বাপিও লুকলো পর্দার পিছনে। অর্থাৎ সার্কাসের লোকজনরা সবাই চোখের বাইরে গেল।

অন্য দর্শকরা অবাক। ভাবছে, এ নিশ্চয় নতুন কোনও খেলা। দেখলাম তাঁবুর কাপড় ফাঁক করে বাপির মুখ উঁকি মারছে। এবার সেই স্যুট-পরা ভদ্রলোক কিছু বললেন জাম্ববানকে উদ্দেশ করে। জাম্ববান নির্বিকার। লোকটি নিচু স্বরে কী জানি বলে চলেছেন।

হঠাৎ জাম্ববান বিকট গর্জন করে উঠল। তার শাঁকালুর মতো দাঁত এবং থাবার প্রকাণ্ড নখগুলো বিস্ফারিত। চোখ জ্বলছে। ভাগ্যিস সে বাঁধা ছিল খুঁটিতে, নইলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড হতে পারত। দর্শকদের ভিতর বাচ্চারা চিৎকার করে কেঁদে উঠল ভয়ে। বড়দের অবস্থাও সঙ্গিন। বেশির ভাগই হুড়োহুড়ি করে দাঁড়িয়ে উঠল। কেউ-কেউ ছুটে গেল বেরুবার গেটের দিকে। রীতিমত এক বিপর্যয়।

স্পেশাল দর্শক দুজনও কম ঘাবড়াননি। জাম্ববানের রুদ্রমূর্তি দেখে কাউন্টি-ক্যাপ তৎক্ষণাৎ উঠে পিছনে মারলেন এক লাফ। আর স্যুট-পরা চমকে পিছু হটতে গিয়ে পড়লেন চেয়ার উলটে।

জুবিলি সার্কাসের মালিক, রিং-মাস্টার এবং আরও কয়েকজন দৌড়ে এল। স্যুট-পরাকে টেনে তুলল। রিং-মাস্টার মাইকেল দাস হাত নেড়ে জাম্ববানকে কিছু বলতেই সে আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দর্শকরাও ক্রমে শান্ত হয়ে যে যার আসন নিল। ওই দুই মাননীয় অতিথি কিন্তু আর খেলা দেখার জন্য বসলেন না। স্যুট-পরা লোকটি পোশাকের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন, পিছু-পিছু কাউন্টি-ক্যাপ এবং তাদের পিছনে গেল বিব্রত মুথুস্বামী।

পরদিন ভোরেই বাপি আমাদের বাসায় হাজির। একগাল হেসে বলল, "কী, কেমন জমেছিল কাল?"

"কে ওরা দুজন? মানে রিংয়ের ধারে আলাদা বসেছিল,"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "খুব খাতিরের লোক বলে মনে হল ?"

বাপি বলল, "তা বটে। খাতিরের লোকই বটে। ডায়মণ্ড সার্কাসের ম্যানেজার আর রিং-মাস্টার। ডায়মণ্ড খুব বড় সার্কাস। কোত্থেকে খবর পেয়ে এসেছিল। পরশু আমাদের খেলা দেখল। তারপর ঝুলোঝুলি, এই কুকুর, বাঁদর, আর ভাল্লুকটাকে ওরা কিনবে। প্রচুর দাম দিতে চাইল। আবার লুকিয়ে-লুকিয়ে আমাদের রিং-মাস্টার মাইকেলকে টোপ দিয়েছিল মোটা মাইনের চাকরি। ওদের ধারণা, মাইকেলই এমন অদ্ভুত খেলা শিখিয়েছে। মানুষের ভাষা বোঝাটা আসলে ছল, খেলার কৌশল। যত বোঝাই ওদের ধারণা পালটায় না, কিছুতেই মানবে না।"

মামাবাবু বললেন, "অন্য ব্যাপারটা কী বললে ?"

লাজুক হেসে মাথা চুলকে বাপি জানাল, "বলেছি এ এক সাধুর কৃপা। হিমালয়ের ভারী জব্বর সাধু। মুথুস্বামী গিয়েছিল কেদার-বদ্রীনাথে তীর্থ করতে। তখন ওই সাধুর দেখা পায়। মুথুর সেবায় তুষ্ট হয়ে আর তার সার্কাসের দুরবস্থার কাহিনী শুনে সাধুজি বর দিয়েছিলেন যে, এক বছরের জন্য ওর সার্কাসের পশুরা কিছু-কিছু মানুষের ভাষা বুঝতে পারবে। ডায়মণ্ডকে যত বলা হয় এসব জন্তু বিক্রি করা হবে না, তবু নাছোড়বান্দা। কেবলই দর চড়ায়।

"শেষে তিতিবিরক্ত মুথু রেগেমেগে ভাবল, ব্যাটাদের কিঞ্চিৎ জব্দ করা যাক। আমিই দিলাম প্ল্যানখানা। মুথু ডায়মণ্ডের ম্যানেজারকে ডেকে বলল, এই জানোয়ারদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করলে ওদের এই বিশেষ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। সাধুজির এই রকম নির্দেশ আছে। এরা কেউ জুবিলি ছেড়ে যেতে চাইবে কি না সন্দেহ। অনেক দিন আমাদের সঙ্গে আছে যে। আমাদের নিজের লোক হয়ে গেছে। যাহোক ভাষা বোঝার খেলা দেখানোর সময় আপনারা নিজেরাই ওই জানোয়ারদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, ওরা ডায়মণ্ডে যেতে রাজি আছে কি না ? যে রাজি থাকবে, সে ফুর্তি দেখাবে। আর রাজি না থাকলে হয়তো রেগে যাবে। যে যে রাজি হবে তাদের আমি ছেড়ে দেব কথা দিচ্ছি।

"দেখলেন তো তারপর কাণ্ডটা ! বেচারিরা খুব নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে। তবে সাধু-মহারাজের হদিস নিয়ে গেছে মুথুস্বামীর কাছ থেকে। মুথু বলেছে, সাধু গুহায় বাস করেন। কেদারতীর্থের পুব দিকের পাহাড়ে। তবে ঠিক কোন্ গুহায় ওঁকে পাওয়া যাবে বলা মুশকিল। মাঝে-মাঝে ডেরা পালটান কি না। পাহাড়িদের কাছে খোঁজখবর করলে হয়তো জানা যাবে।

"সাধুজির ইয়া তাগড়াই চেহারা। ছ' ফুট খাড়াই। টকটকে রঙ। মাথায় মস্ত জটা। ধবধবে পাকা দাড়ির বহর আড়াই হাত। খুব সাবধান। দিবারাত্র বুনো জন্তুরা তাঁর আস্তানার চারপাশে ঘোরাফেরা করে। সাধুজি হিংয়ের কচুরি খেতে ভীষণ ভালবাসেন। যোগাড় করে খাওয়াতে পারলেই নির্ঘাত বর লাভ।"

একটু মিচকে হেসে জানাল বাপি, "মনে হয় সামনের গ্রীষ্মেই ওরা হিমালয়ে ছুটবে সাধুজির খোঁজে।"

ছবি : দেবাশিস দেব

সমাপ্ত
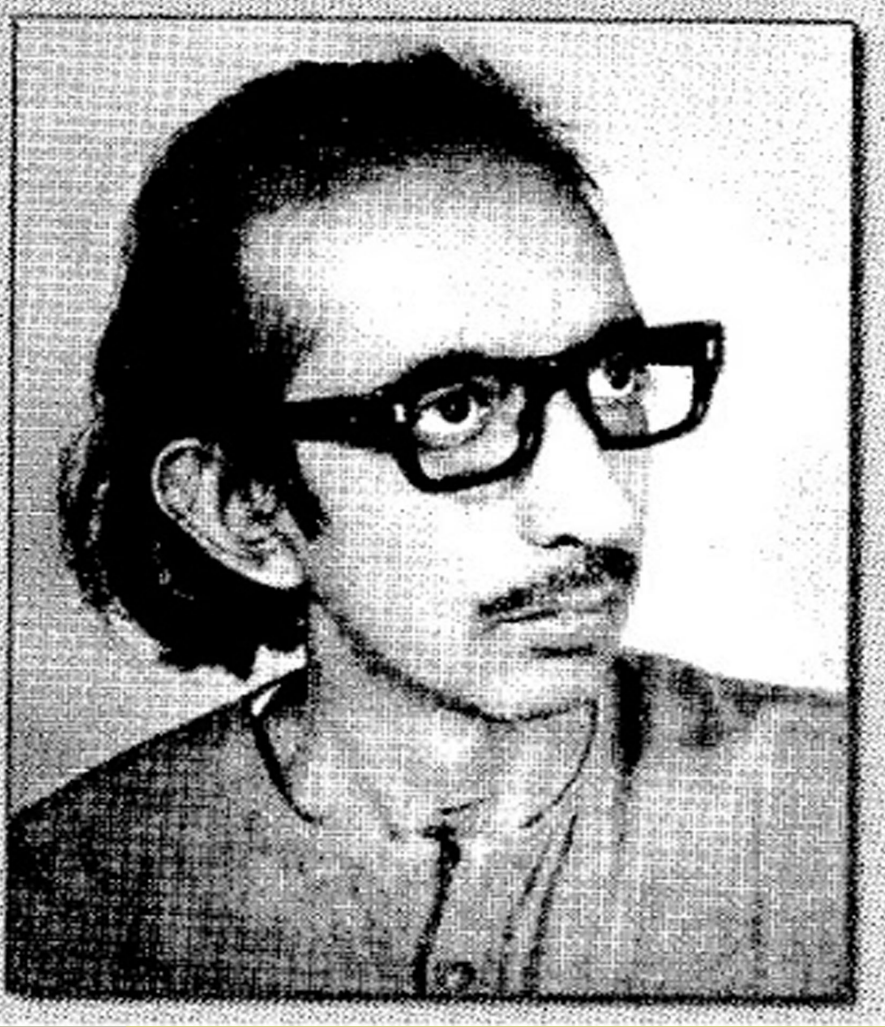
শিশু-কিশোর সাহিত্যিক অজেয় রায়ের জন্ম ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে। দিদিমা ননীবালা রায় শ্রীনিকেতন সেবাবিভাগের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। অজেয় রায়ের মা লতিকা রায় শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-অভিনয়ে লতিকা রায় একাধিক বার নৃত্য পরিবেশন করেছেন। তার পুত্রের নাম 'অজেয়' রাখেন রবীন্দ্রনাথ। পিতা পূর্ণেন্দু রায়। অজেয়রা ছয় ভাইবোন। অজেয় বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বিশ্বভারতীর কৃষি-অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্রে গবেষককর্মী রূপে যুক্ত ছিলেন ও যথাসময়ে অবসর গ্রহণ করেন। অজেয় শিশু-কিশোরদের জন্য লিখেছেন বহু বছর ধরে। লেখিকা লীলা মজুমদারের উৎসাহ ও উপদেশ তার লেখক জীবনের প্রধান প্রেরণা। প্রচুর গল্প ও একাধিক উপন্যাস লিখেছেন সন্দেশ, আনন্দমেলা, কিশোর ভারতী, শুকতারা প্রভৃতি পত্রিকায়। সরস ও রহস্য রচনা, বিজ্ঞানভিত্তিক অ্যাডভেঞ্চার ইত্যাদি ছিল অজেয়বাবুর প্রিয় বিষয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'মুসুক', 'ফেরোমন' 'মানুক দেওতার রহস্য সন্ধানে' ইত্যাদি। তার কিছু ছোটো গল্প হিন্দিতে অনুদিত হয়েছে। শিশু সাহিত্যিক অজেয় রায় অনেকগুলি সাহিত্য-সম্মান লাভ করেছেন। জগত্তারিণী স্মৃতি পুরস্কার, বিশ্বভারতী-প্রদত্ত আশালতা সেন স্মৃতি পুরস্কার, 'সন্দেশ'-প্রদত্ত সুবিনয় রায় স্মৃতিপদক ও পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশুসাহিত্যে বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার প্রভৃতি।